একটি প্রহরের অপেক্ষায়

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক মহান রব্বুল আলামীনের জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টিজগতের রহমত হযরত মুহাম্মাদ সাঃ এর উপর।

"একটি প্রহরের অপেক্ষায়" বইটির সাথে জড়িয়ে রয়েছে নবীন প্রজন্মের এক ঝাঁক মেধাবী হাতের আলতো খোঁচা, তাদের স্বপ্নালু চোখের বর্ণিল আশা ও এক মিছিল মানুষের ভালবাসায় জড়ানো অপেক্ষার প্রহর। পুরো বইটি রচিত হয়েছে বেলাল নামের একটি চরিত্রকে ঘিরে। বইঝুড়ি ডট কম আয়োজিত ছোট গল্প লিখন প্রতিযোগিতায় গল্পের প্লট লিখে দিয়েছিলেন সময়ের স্বনামধন্য পাঠকপ্রিয় লেখক আরিফ আজাদ ভাই। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী অন্য সকলে সেই গল্পের ভূমিকা টেনে নিয়ে যে যার মত শেষ করেছেন গল্পগুলো। কেউ বেলালকে শিশু বালক হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন, কেউবা তরুণ আর কেউবা বেলালকে টেনে নিয়েছেন স্ত্রীহারা প্রৌঢ় বয়সে। প্রত্যেকটি গল্পের তার নিজস্ব স্বকীয়তা রয়েছে। পুরো দেশে ছড়িয়ে থাকা আমাদের নবীন প্রজন্মের মধ্যেও যে অসামান্য সাহিত্যপ্রতিভা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তা ফুটে উঠেছে এই বইয়ের গল্প গুলোর মাধ্যমে।

বইটি মূলত সম্পাদনা করার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন ইয়াছির মিশুক ভাই। কিন্তু নানাবিধ ব্যস্ততায় তিনি আর সামনে আগাতে পারেননি। অতঃপর অতি নগন্য ও সামান্য জ্ঞানের অধিকারী এই বান্দার উপর দায়িত্ব এসে পড়েছিল বইটি সম্পাদনার। সাধ্যের ভিতরে যতটুকু সম্ভব সম্পাদনার চেষ্টা করেছি, তারপরও ভুল থেকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। পাঠকদের কাছে অনুরোধ থাকবে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে পড়ার।

পরিশেষে যার নাম স্মরণ না করলেই নয় তিনি হলেন উম্মেহানি বিনতে আব্দুর রহমান আপু। প্রতিযোগিতায় জমা হওয়া অসংখ্য গল্প থেকে বইয়ে ছাপানোর উপযুক্ত গল্পগুলোর প্রাথমিক বাছাইকরণ প্রক্রিয়া তাঁর মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর মেধা, জ্ঞান ও পরিশ্রমে বারাকাহ দান করুন। পরিশেষে এই বইয়ের সমস্ত গল্পের লেখক/লেখিকা, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী

কিন্তু বইয়ের কলেবরে গল্পগুলো বাদ পরে যাওয়া লেখক/লেখিকা, প্রকাশক, পরিবেশক এবং এর সাথে জড়িত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য দোয়া ও বুকভরা ভালোবাসা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ সকলের হৃদয়ে ঈমানের নূর ঢেলে দিন, অন্তরকে সত্য আলোর ঝলকানিতে ফকফকা করে দিন।

আল্লাহ তায়ালা এই গুনাহগার, নাফরমান ক্ষুদ্র বান্দাকেও তাঁর কবুল বান্দাদের তাঁবুতে অন্তর্ভূক্ত করুন।

ওয়ালিদ আরসালান
ঢাকা।
০১-০২-২০২২

সূচিপত্র

কথা ছিল ৮

জোনাক পোকার ঘর ১১

প্রতীক্ষিত বসন্ত ১৭

জল রঙা মেঘ ২৬

আশ্চর্য মায়ার বেড়াজাল! ৩১

চিরকুট ৩৪

বিভ্রান্তির বেড়াজালে ৪০

ফিরে দেখা ৪৪

এক চিলতে হাসি ৫০

ফেরার অপেক্ষায় ৫৪

বোধোদয় ৫৬

ফিরে আসা ৬৩

কুরবানি নিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের জবাব ৬৯

নীড়ে ফেরার গল্প ৭৬

প্রতিজ্ঞা ৮৩

নতুন সূর্যোদয় ৮৮

এবং সন্ধ্যালোক ৯৩

পদার্পণ ১০০

পরিবর্তন ১০৬

মোমের শহর ১১৪
ঈমানী সুধা ১১৮
মাজলুমের আর্তনাদ..... ১২৬
অপেক্ষার প্রহর ১২৯
কুড়িয়ে পাওয়া অমূল্যনিধি..... ১৩২
অর্ধেক দ্বীন ১৪১
গোধূলি বেলা..... ১৪৪
হাওয়া বদল ১৪৯
প্রত্যাগমন ১৫২
অবিশ্বাসীদের পরিবারে ১৫৫
তোমার প্রতীক্ষায় ১৬০
যেন পূর্বের কোনো জন্মে ছিল প্রেমের পাওনা দেনা ১৬৭

সন্ধ্যে গড়ালে হাঁড়-কাপানো শীতের দাপটে খটখট করে কাঁপতে থাকা শরীরে সামান্য একটু উষ্ণতার যে ক্ষুধা জাগে, তা মেটানোর জন্য রাস্তার পাশের কুকুরটিকেও জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকা যায়। বিলালকেও সেভাবেই শুয়ে থাকতে দেখা যায় মাঝেমাঝে। কখনও শহীদ মিনারের পাদদেশে শুয়ে থাকা কালো কুচকুচে কুকুরটির উপর মাথা এলিয়ে শুয়ে পড়ে সে, কখনওবা শুয়ে থাকা বিলালের কাঁধের কাছে বসে কানদু'টো চেটে দিয়ে যায় কুকুরেরা।

সেদিন সন্ধ্যায় রাস্তার পাশের ম্যানহোলের স্ল্যাবের উপর ঘুমোতে যাওয়ার ক্ষণে— কাছে থাকা পতাকাটি গায়ে টেনে নিয়েছিল শীত নিবারণের জন্য।

"কথা ছিলো একটি পতাকা পেলে
পাতা কুড়োনির মেয়ে শীতের সকালে
ওম নেবে জাতীয় সংগীত শুনে পাতার মর্মরে।"

তবে শীতের সকালে না হলেও, শীতের রাতে ঠিকই পতাকাটি দিয়েছিল সঙ্গ, উষ্ণতার রসদ যোগানোর জন্য। আমাদের পতাকা পাওয়াটা তবে স্বার্থক!

পরদিন ভোরে একজন স্যুট-বুট-কোট-টাই পরা বাবু সাহেব এসে বিলালের গা থেকে পতাকাটি টেনে-হিঁচড়ে ছিনিয়ে নিয়ে তার কোমর বরাবর সজোরে একটা লাথি মেরে বললেন, "পতাকা গায়ে দিয়ে শোয়ার জিনিস? পতাকাকে কীভাবে সম্মান করতে হয় জানিস না? শালা অশিক্ষিত মূর্খের দল!" বলেই তিনি সপাক-শব্দে পতাকাটা ঝাড়া দিয়ে ধূল ঝেড়ে নিলেন। অতঃপর সেটি ভাঁজ করে নিয়ে বিলালকে আরও দু'টো অশ্রাব্য গালি দিতে দিতে চলে গেলেন নিজের পথ ধরে। আৎকা লাথি খেয়ে অসময়ে নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় খেই হারিয়ে ফেলা বিলাল কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। তবে সে যে কিছুটা ভীতি, বিরক্তি আর ক্ষোভের আচ্ছাদনে ছেয়ে ছিল, তা তার চোখ-মুখ দেখে সহজেই বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু ওই যে, কে-ই বা দেখবে, কার-ই বা এত দেখার সময়!

রাস্তার ধারে বসে থেকে থেকে সে শুধু ছুটে চলা যানবাহনগুলোর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিল। ইট-কাঠ-পাথরের এই শহুরে যান্ত্রিকতার ভিড়ে তার মনে বারবার উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল তার বাবার সাথে কাটানো মুহূর্তগুলো। এইতো ক'দিন আগেও সে তার বাবার সাথে পদ্মার পাড়ে বসে মুড়ি-চানাচুর বিক্রি করত। জন্মের পর থেকে কখনও মা'কে দেখেনি সে। ওই বাপ-ই ছিল তার সব। কিন্তু সেদিনের সেই মিছিলের ভিড়ে, সেদিন

যখন একের পর এক রাবার-বুলেট আর টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে যাচ্ছিল সশস্ত্র পুলিশের দল, সেদিন যে বিরোধীদলীয় সমাবেশের উপর অমানুষিক লাঠিচার্জ করা হলো; তারপর থেকে বিলাল তার বাবাকে আর খুঁজে পায়নি। এপাশ থেকে সুনামির মতো ধেয়ে আসা মিছিলের জলোচ্ছ্বাস, আর ওপাশ থেকে মুষলধারে ছুটে আসা বুলেটের মুখোমুখি ছিল তারা দু'জন। আর তাদের মুড়ি-চানাচুরের ডালি পড়ে ছিল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, রাস্তার এধার পেরিয়ে ওধারে।

যদি ওর বাবা থাকত, তাহলে আর এভাবে রাস্তায় পড়ে পড়ে মার খেতে হতো না। দু'বেলা দু'মুঠো পান্তা খেয়ে হলেও বেঁচে থাকা যেত অনায়াসেই! যদি ওর বাবা থাকত, তাহলে আর শীতের রাতে উষ্ণতার খোঁজে পতাকা জড়াতে হতো না গায়ে। বাবা বেঁচে থাকলে আর পতাকার কাছে ধরনা দিতে হতো না তাকে। অথচ...

"কথা ছিলো একটি পতাকা পেলে
ভূমিহীন মনুমিয়া গাইবে তৃপ্তির গান জ্যৈষ্ঠে-বোশেখে,
বাঁচবে যুদ্ধের শিশু সসম্মানে সাদা দুধে-ভাতে।"

সূর্যটা ধীরে ধীরে সবটুকু ডুবে গেছে। লালিমাটাও হয়েছে বেশ আবছা। কুয়াশারা একটু পরই শ্বেত-সন্ত্রাসের ন্যায় ঘিরে ধরবে চারিপাশ, প্রকৃতি মুড়ে যাবে ধবধবে সাদা কাফনে। আর সে কাফনে মুড়ে বিলাল নিজেকেও খুঁজে নিতে চাইবে কোনো অন্ধকার মেটে-কুটিরে। আচ্ছা, এ শহরের বিলালদের কি কোনো কুটির বরাদ্দ থাকে আদৌ? কুয়াশার কাফনই কি বিলালদের অন্তিম পরিধেয়? নাকি তাদের মনে কখনও কখনও লাল-সবুজরঙা কাফনেরও সাধ জাগে? লাল-সবুজ কাফন কি সয়ে নিতে পারবে— এ নীল-রক্তিম অযাচিত বেদনার ব্যথা? অথচ—

"কথা ছিলো একটি পতাকা পেলে
আমি আর লিখবো না বেদনার অঙ্কুরিত কষ্টের কবিতা"

কথা তো অনেক কিছুই ছিল, অনেকে অনেক কথাই তো দিয়েছিল! কতজনে কতটুকু কথাই বা রেখেছে শুনি? কথা তো অনেক কিছুই থাকে, সব কি আর রাখা হয়। যেন— কথা ছিল, কথা রাখার কথা ছিল না!

কথা দিয়ে যায়, কথা থেকে যায়;
শুধু রাখা হয় না, কথা পড়ে রয়, পড়েই রয়।

জোনাক পোকার ঘর

জোবায়েদ জাদিদ

[১]

প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। দূর পাহাড়ের কোলে আস্তে আস্তে লুকিয়ে পড়ছে দাপুটে সূর্যটা। বিলাল অপেক্ষা করে আছে একটা প্রহরের। যে প্রহরটা নিমিষেই তার মনকে করে দিবে পুলকতায় পরিপূর্ণ। আযানের শিরীন সুরের মাধবীলতায় বিলালের কাঙ্ক্ষিত সেই প্রহর নামলো। ধীর পায়ে বিলাল এগিয়ে চললো মাসজিদ পানে। মাসজিদ তার হৃদ-মাঝারের এক টুকরো সবুজাভ আলো। যে আলো তার মনের কালোকে ম্রিয়মাণ করে মুছে দেয় মুহূর্তেই। সালাত শেষ করে বিলাল বেরুলো আন্তঃনগর ট্রেনের উদ্দেশ্যে।

চান্নি-পসর রাত। আকাশজুড়ে খন্ড খন্ড মেঘের পুঞ্জের আনাগোনা। সাথে পুরো ধরণির গায়ে যেন শাদা-সফেদ দুধের চাদর। এমন নিটোল চাঁদের রাতের আধো আধো আলোতে হুমায়ুন আহমেদ মরতে চেয়েছিলেন। গৃহত্যাগী হতে চেয়েছিলেন।

> "ও কারিগর দয়ার সাগর, ওগো দয়াময়
> চান্নি-পসর রাইতে যেন আমার মরণ হয়।"[১]

বিলাল শুনেছে, এমন চান্নি-পসর রাতেই নাকি তার জন্ম হয়েছে। বিলালের সেই জনমদুখিনী মা আজ বেঁচে নেই। দীর্ঘদিন পর বিলাল আজ মায়ের কবর যিয়ারত করতে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর হর্ণ বাজিয়ে ঝকঝকাঝক ট্রেন ছুটলো। ট্রেনের জানালার পাশে বসে ঘোলাটে গাছগাছালির অভয়ারণ্য দেখে বিলাল হারিয়ে যায় সুদূর অতীতের অমরালয়ে। মা-বাবা, বার্ধ্যকের ভারে কুঁজো হয়ে যাওয়া বুড়ো দাদু, ভোলাভালা বড় ভাই আর বিলালকে নিয়েই ছিল তাদের ছোট্ট সংসার। সময়ের সাম্পানে, দাদু হারিয়ে যায়। এর আগে বিলাল দাদা, নানা, নানুদের বিন্দুমাত্র আদর-স্নেহের পরশ পায়নি।

---

[১] হুমায়ুন আহমেদ

বিলালের জন্মের আগেই নাকি তাদের জীবনের পাঠ চুকে গেছে। একমাত্র দাদুই ছিল যিনি কিনা বিলালকে পরম মমতায় মাতোয়ারা করে রাখতেন। সেই দাদু আজ মৃত্যুপুরীতে পতিত। কবরবাড়িতে প্রোথিত! দাদুর মৃত্যুশোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই দিনকয়েকের ব্যবধানে জন্মদাত্রী জননী মা'কে চিরতরে হারায় বিলাল। এমন শোকের শঙ্কিল আবহ যেন সামাল দেওয়ার নয়! প্রবল কান্নার রোনাজারির ছলে অবিরত মাটিতে গড়াগড়ি খায় বিলাল, সমস্ত শরীর ধূলোয় ধূসরিত করে। সেদিন কান্নার রোদনধ্বনিতে বাড়ির আনাচ-কানাচ চাউর করেছিল বিলাল। তারপর, মাকে আপাদমস্তক সাদা কফিনে মুড়িয়ে—খাটিয়ায় করে নিয়ে যখন কবরে চিরনিদ্রায় শায়িত করে দেয়া হবে তখন বিলাল শোকের সটকে বেহুশ হয়ে পড়েছিল কবরের পাশের কাদামাটিতে। বিলালের হুঁশ হারা নিথরতায় নিরবচ্ছিন্ন অচেতন দেহের টনক নড়ে মাঝরাত্তিরে। উর্ধশ্বাসে উঠে বিলাল মাকে ত্রিসীমানায় না পেয়ে ফের গগনবিদারী চিৎকারে চাউর করে সারা বাড়ি। ভোলাভালা বড় ভাইটা ঘুম থেকে লাফিয়ে জেগে উঠে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বুকের পাটাতনে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ছোট্ট বিলালকে। মিনিটখানেক পর পাশের বাড়ির অদূরের চমির চাচা হামাগুড়ি দিয়ে ছুটে আসে—বিলালের মাথায় আলতোভাবে বুলিয়ে দেয় সান্ত্বনার সুশীতল পরশ! আর ডুকরে কেঁদে উঠে বলে-

কাঁদিসনে বাপরে, তোর দুঃখি'য়া কপাল। কি আর করবি ক। তোর বাপজানও শোকে পাথর হইয়া কই জানি পইড়া রইছে! হেন জায়গা নাই, যেইহানে খুঁজি নাই তোর বাপজানরে। তুই সবুর কর বাপ। আল্লাহ তোর ভালা করবই।

চমির চাচার সান্ত্বনার সারথি হয়ে আবার ঘুমাতে যায় বিলাল। মা'য়ের সযতনে সেলাই করে রেখে যাওয়া তুলতুলে নরম বালিশটায় আলতোভাবে মাথা রাখে। কোনো এক অব্যক্ত যন্ত্রণার যোহরা তাকে ঘুমাতে দেয়না। বারেবারে কবরের কথা স্মরণে আনে। হায়! একদিন তো ঠিকই এ নস্যি জীবনের লেনাদেনা ফুরিয়ে যাবে। রঙের-ঢঙের এই সংসার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। নতুন ঠিকানা হবে কবর বাড়ি। মাটির বাড়ি। যেখানে একমাত্র সহায়-সম্বল হবে তাকওয়া! যেখানে কেবলমাত্র এই পৃথিবীর প্রতিপালকের ক্ষমতা ছাড়া আর কারো ক্ষমতার বাহুলতা চলে না।

কবরের এমন করুনঘন ভাবনায় বিলাল, কান্না-জড়িত কণ্ঠে গুনগুন করে জসীমউদ্দিনের 'কবর' কবিতার পঙক্তি আওড়ায়—

কেউ যখন কোনো ভালো খাবার-দাবার দিতো, নিজে না খেয়ে ঠিকই বিলালের জন্য সযত্নে সাজিয়ে রেখে দিতেন। আজ বিলালের সেই মা নেই। আছে মায়ের কবরের ধূলো, কবরের ঝুরঝুরে মাটি!

[২]

নিশুতি রাত। নিঃসীম অন্ধকারে নিমগ্ন বিভাবরী।

চারদিকে সুনসান নীরবতা, অতন্দ্র প্রহর। কোনো জনমানবের চিহ্ন নেই। ঘনঘোর আঁধারের নৈরাজ্যে পুরো বাড়িটা যেন আস্ত এক বিরানভূমি। আচমকা, কোথা থেকে ছুটে আসলো একঝাঁক জোনাক পোকার দল। নিমিষেই সবুজাভ আলোর আভায় সুরভিত হয় সারা বাড়ি। বিলালের মনে পড়ে, ছোটবেলার কথা। ছোটবেলায় ঝাকবাঁধা জোনাকিদের দেখলে দুই একটা হাতের মুঠোয় পুরে নিতো বিলাল। হাতের তালুতে জ্বলতো টিমটিম করে। তারপর কচিকাঁচা বাচ্চাদের হাঁক ছেড়ে ডেকে বলতো - দেখ ম্যাজিক—আমার হাতে আলোর ফুঁলকি জ্বলছে!

কেউ কেউ টের পেলেও বেশিরভাগ বাচ্চারাই বোকা বনে যেত।

আজকে বিলালের আশপাশ জুড়ে জোনাকিদের মহীরুহের মেলা থাকলেও আগেকার মজার ছল নেই। আশেপাশে কচিকাঁচা বাচ্চাদের আনাগোনা নেই।

জোনাকি আলোর ঝিলমিল আভার ঝলকানিতে বিলাল অদ্ভুত মিল খুঁজে পায় জীবনের জয়ন্তীর।

বিলালের মনে হয়, টিমটিম করে জ্বলা জোনাকি যখন নিভে গিয়েও ফের রুদ্ধশ্বাসে জ্বলে উঠে সেটাই নতুন এক একটি জীবন কণা!

মিটমিট করে জ্বলতে থাকা জোনাকিদের দেখলেই আজকাল কেমন যেন—গা শিউরে উঠে বিলালের। প্রবল প্রকম্পনে দুরুদুরু করে বুকের পিঞ্জর। মনে হয়, জোনাকিটার আলো-আঁধারি খেলার মতো একদিন তার জীবনপ্রদীপ নিকষ আঁধারে নিভে যাবে। ফুরে যাবে বেলা। প্রস্থান হবে এক অসীম জগতে। এ যে ধ্রুব সত্য। অনিবার্য সত্য। পরম সত্য।

"বল, যে মৃত্যু হতে তোমরা পলায়ন করছ তা অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে"[৩]

ভাবনার ডালপালা মেলে মাঝে মাঝে বিলাল ভাবে নিসর্গের টানে দিগ্বিদিক ছুটে চলা সে কবরবাড়িতে একটুখানি নিসর্গের ছোঁয়া পাবে কি? দূর্বিনীত নীলাকাশ, জোছনার শিশির-তারার ঝিকিমিকি তার কবরকে কি আলো ঝলমলে করে রাখবে? নাকি তার কবরজুড়ে গ্রাস করে থাকবে নিরভ্র অন্ধকারের অভয়া?

পরক্ষণেই প্রশ্ন জাগে মনে—পারবে কি সে এমন একটা জীবন কাটিয়ে দিতে?

যে জীবনে থাকবেনা বিষাদ-বিবাদের কল্লোলধ্বনি। যে জীবন মাড়াবে না কাঁটাভরা মেঠোপথ। সাদরে-সমাদরে গ্রহণ করবেনা—বিষমাখা পুষ্প। নোঙর ফেলবেনা ইঁদুর বাদুরের পিছে। যে জীবন ছুটবে সরল পথের খোঁজে—ভাববে স্রষ্টার সুনিপুণ নিপুনতা নিয়ে। নিজেকে সমর্পন করে দিবে এপার-ওপারের রাজাধিরাজের কাছে। তিনিই তো বিলালের রব। বিলালের জীবন-মরণ সব তো তাহারই সমীপে নিবেদন। এমন যদি হয় জীবন বিলালের—তবে, কবরবাড়িতে মিললেও মিলতে পারে একগুচ্ছ আলো ঝলমল। না হয় ঘোর অন্ধকারের লেলিহান অঙ্গারে মিলে যাবে এ জীবনের আয়োজন।

মায়ের কবরের পাশের বৈঠকখানায় বসে এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে রাত্রির শেষ প্রহর নেমে এলো বিলাল ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বিলাল জোর পায়ে কদম ফেলে ছুটে যায় চিরচেনা পুকুর ঘাটে। ঘাটটা অতি নড়বড়ে হয়েছে। চমির চাচা হয়তো ব্যবহার করে। সাবধানে সন্তর্পণে পা এলিয়ে আঁটোসাটো হয়ে বসে বিলাল। পুকুরের পানিতে সবুজাভ শেওলার স্তুপ। সদ্য ফোঁটা দু'একটা শাপলাও ঝাপসা চোখে দেখা যাচ্ছে। বিলাল দু-হাত দিয়ে শেওলার স্তর সরিয়ে দেয়, স্ফটিক পানির দেখা মিলে। তড়িঘড়ি করে অযু সেরে নেয়, তারপর মায়ের কবরের সামনে গিয়ে সটান দাঁড়ায়। অস্ফুট স্বরে বলে উঠে,

মারে, তুই কিরাম আছিস মুই জানিনে। দোয়া করি, তোরে যেন আল্লাহ ভালো রাহে। তোর কবরটা যেন জান্নাতের বাগিচা বানায়ে দেয়। আর, তোর বাজানরে কইছিস যেরমভাবে চলতে, মুই হেরমেই চলি। তোর দোয়ায় আল্লাহ মোরে সুপথের সন্ধান

---

[৩] সূরা জুমু'আ : ৮

প্রতীক্ষিত বসন্ত

মাহিরা

[১]

প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। দূর পাহাড়ের কোলে আস্তে আস্তে লুকিয়ে পড়ছে দাপুটে সূর্যটা। বিলাল অপেক্ষা করে আছে একটা প্রহরের। পরম প্রতীক্ষিত সে প্রহর। বছর দেড়েকের দাম্পত্যজীবনে তার স্ত্রী খাদিজা প্রথমবারের মতো দেখবে বিলালকে। হ্যাঁ, প্রথমবার। টানা ছয় বছর ধরে দৃষ্টিশক্তিহারা হয়ে থাকা প্রিয়তমা আর-রাহমানের অনুকম্পায় সদ্য চোখের জ্যোতি ফিরে পেয়েছে যে!

অস্তমিত আদিত্য যখন আবার নতুন করে উদিত হবে ভুবনজুড়ে আলো বিলানোর অভিপ্রায়ে তখনই সাঙ্গ হবে সে প্রতীক্ষার প্রহর। ক'দিন আগে বিলালেরই এক নিকটাত্মীয়া খাদিজার নামে মৃত্যুকালীন আই-ডোনেট করে গিয়েছিলেন। সেদিনের কথা ভাবলে আজও বিলাল নুইয়ে যায় মহান রবের কৃতজ্ঞতায়।

এরপর অল্প ক'দিনের মধ্যে খাদিজার অপারেশনের টাকাগুলো বিলাল যে কিভাবে জোগাড় করেছে সে দিনগুলোও একেকটা উপন্যাস। তার উপর অপারেশন ঠিকঠাক হয় কিনা সেই চিন্তায় জর্জরিত ছিল মন-মস্তিষ্ক।

তৃতীয় স্তরের সামান্য একজন সরকারী কর্মচারীর কাছে এর পুরো এরেঞ্জমেন্ট করাটা যে সাধ্যাতীত সেটাতো সহজেই অনুমেয়। ফলাফলস্বরূপ ক্ষয়িষ্ণু কাঁধে জুটেছে ধার-দেনার বিশাল ভার। তবে আপাতত তার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখকর সংবাদ হচ্ছে- খাদিজার আই সার্জারী সাকসেসফুল!

যদিও দুদিন আগেই খাদিজার চোখের ব্যান্ডেজ খোলা হয়েছে, বিলালের যাওয়া হয়ে উঠেনি। নিয়ম বেঁধে দেওয়া কর্পোরেট দুনিয়ায় তার মতো নগন্য কর্মচারীদের চাইলেই তো দু'দিন পরপর ছুটি মিলানো যায়না। উপরন্তু সদ্য ট্রান্সফার হয়ে নতুন এই পাহাড়ি এলাকায় এসে উঠেছে সে। আজকেও যে ছুটিটা ম্যানেজ করতে পেরেছে সেটাকেও একটা মিরাকল বলা চলে।